সেইসব ছায়াময়দের

ভূমিকা

এই বইয়ের প্রথম উপন্যাসিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'শিহরন বার্ষিকী'-এর দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যায়, ২০২৩ সালে। কিছুটা পরীক্ষামূলক ধাঁচে কাহিনিটির আঙ্গিক নির্মাণ করেছিলাম, ভৌতিক রসের থেকেও অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলাম মনস্তত্ত্বকে। আমি বিশেষ আশাবাদী না থাকলেও—পাঠকদের পক্ষ থেকে লেখাটির জন্য যে প্রভূত প্রশস্তি ইত্যাদি পেয়েছিলাম, তা আমার যাবতীয় সংশয় দূর করে দিয়েছিল। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ শিহরন বার্ষিকীর সম্পাদকমণ্ডলীর কাছেও—যাঁরা প্রথম বছর থেকে সাদরে আমাকে লিখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আমার কলমের উপর অগাধ আস্থা পোষণ করেছেন।

সেই বছরই প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল একটি একক বইয়ের জন্য। পরিকল্পনা করা হয়েছিল—একই গোত্রের আরেকটি নতুন উপন্যাসিকা আমি লিখে দেব এবং প্রথমটির সঙ্গে একত্রিত হয়ে মলাটবন্দি হবে সেও।

পরিকল্পনাটি যে বিগত বইমেলায় বাস্তবায়িত হয়নি, তার দায় সম্পূর্ণভাবে আমার। বিবিধ ব্যস্ততায় আমিই লেখাটি সম্পূর্ণ করে উঠতে পারিনি। এরপরও যে প্রকাশনা সংস্থার কর্মকর্তারা আমার উপর ভরসা রেখেছেন এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন, এ জন্য আমি তাদের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এক বছর পর অবশেষে যে প্রথম লেখাটিতে আরও কিছু সম্পাদনা এবং দ্বিতীয় লেখাটির কাজ শেষ হয়েছে এবং বইটি প্রকাশিত হতে চলেছে, সেই কৃতিত্বের দাবিদারও তাঁরাই।

অত্যন্ত রগরগে ভৌতিক কাহিনি আমি পড়তেও স্বচ্ছন্দ নই, আর লিখতে তো নই-ই। বীভৎস ক্রিয়াকলাপ এবং উগ্র বর্ণনার পরিবর্তে আবহ নির্মাণের সূক্ষ্মতা এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দিতেই আমি অধিক আগ্রহী। অতিলৌকিকত্বের মধ্যেও বাস্তবের যে ছায়া নিহিত থাকে, তাকে মূর্ত

করাতেই আমার প্রধান ঔৎসুক্য। চেষ্টা করেছি এই বইতেও সেই ধারা বজায় রাখতে। ধন্যবাদ বর্ণশোধনকারী, প্রচ্ছদশিল্পী এবং অঙ্গসজ্জাকারীদের—যাঁদের সহায়তা ছাড়া বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত না।

এবার, বাকি বিচারের ভার সমর্পণ করলাম পাঠকদের হাতে, তুচ্ছ লেখকজীবনে যাঁদের মনোযোগটুকুই আমার শ্রেষ্ঠ অর্জন।

১৫.০১.২০২৫
বসিরহাট

শ্রীজিৎ সরকার

কুয়াশা ১১
নৈঃশব্দ্য ৮৯

কুয়াশা

কুয়াশার শুরু

আকাশে আজ চাঁদ ওঠেনি। কিংবা উঠেছে হয়তো, তারপর চাপা পড়ে গিয়েছে মেঘের প্রবল উপস্থিতিতে। চাঁদের ক্ষীণ, স্নিগ্ধ, লাজুক জ্যোতির সামর্থ্য হয়নি মেঘেদের বুক বিদীর্ণ করে প্রকাশিত হওয়ার। সুতরাং, নিদাগ স্লেটের মতো নিকষ কালো রূপ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে আকাশকে।

সেই মেঘময় আকাশের নীচে অনেক আলোকিত, জমজমাট জায়গার পাশাপাশি আছে আগাছায় ভরা, অন্ধকার, প্রায় পরিত্যক্ত একটা বাগান। ঝোপঝাড়ের আড়ালে, নিজেদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে বসে ঝিঁঝিঁপোকারা ডাকছে সেখানে; রাতচরা পাখিরা ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। হঠাৎ হঠাৎ ত্রস্ত-ব্যস্ত ভঙ্গিতে সরসর করে যেন চলে যাচ্ছে কারা! তারা সাপ হতে পারে, বিছে হতে পারে, গিরগিটি হতে পারে, ইঁদুর কিংবা ছুঁচো হতে পারে, হতে পারে অন্যকিছুও। তবে এই ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ, ঝটাপট্-ঝটাপট্ সর্-সর্-সর্ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই এখানে, কিংবা হয়তো আছে! তবে নীরব রাত্রির সেই একান্ত নিজস্ব ভাষা পড়ার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই।

আশপাশের বহুদূর পর্যন্ত বোধহয় কোনও লোকবসতি নেই। আর যদি থেকেও থাকে, তবে সেখানকার বাসিন্দাদের আর এদিকে আসার বিশেষ ইচ্ছা নেই। বাগানের ঠিক মাঝখানে, প্রায় ছোটোখাটো পুকুরের মতো বড়ো একটা চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যথেষ্ট তো বটেই, তার গভীরতাও এমন কিছু কম নয়। সাঁতার কাটতে না পারলেও, অনায়াসে চার-পাঁচজন মানুষ সেখানে শরীর ডুবিয়ে স্নান করতে পারবে। তবে চৌবাচ্চার শরীরে জমে থাকা পুরু মসের আবরণ আর জলের উপরে ভেসে বেড়ানো শুকনো পাতারাই বলে দিচ্ছে যে, বহুদিন এই চৌবাচ্চার জল কেউ ছুঁয়েও দেখে না! অন্ধকারের থেকেও বেশি কালো সেই জলের রঙ। কে যেন লিটার লিটার কালি গুলে দিয়েছে তাতে! কত রাত এখন? সাড়ে বারোটা? একটা? নাকি দেড়টা? জানা নেই। জানার প্রয়োজনও নেই। এই বাগানের বাসিন্দারা মনুষ্যসৃষ্ট ঘড়ির তোয়াক্কা করে না। যে ঘড়ি সৃষ্টিকর্তা লুকিয়ে

রেখেছেন অসীম প্রকৃতির মধ্যে, সেটাতেই তাদের দিব্যি কাজ চলে যায়।

অন্যান্য দিনের মতো বাগানের নিজস্ব নৈশকালীন সংসার আজও চলছিল নিজের নিয়মে। এমন সময় ছন্দপতন!

একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বাগানের বাইরে। বড়ো বেশি সতর্ক গাড়িটার আগমন। যেন সে কাউকে বিরক্ত করতে চায় না, কাউকে জানতে দিতে চায় না নিজের উপস্থিতি। দাঁড়ানো মাত্র তার হেডলাইট নিভে গিয়েছে ঝুপ্ করে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে ইঞ্জিনের শব্দ, অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছে ধাতব শরীর। ঝপাঝপ্ খুলে গেল গাড়ির দরজাগুলো। কতকগুলো সাবধানী পদশব্দ, ঠিক গাড়ির দরজা থেকে এগিয়ে আসতে আসতে থেমে গেল একেবারে চৌবাচ্চার পাশে পৌঁছে। কিছু একটা বয়ে নিয়ে এসেছে তারা। জিনিসটা এমনকিছু ছোটোখাটো নয়; বরং, বেশ বড়োসড়ো। সেটাকে এইটুকু পথ নিয়ে আসতে গিয়েই হাঁফিয়ে গিয়েছে তারা! তবে সেটা যে ঠিক কী, অন্ধকারে তা বোঝার উপায় নেই।

একটুখানি বিরতি... একটু চাপা ফিস্‌ফাস্, কিছু প্রস্তুতি...

তারপরই জিনিসটাকে তারা ফেলে দিল চৌবাচ্চার মধ্যে।

ঝুপ্! আওয়াজটা উঠেই মিলিয়ে গেল নিস্তব্ধ রাতের বুকে। পদশব্দগুলো আবার দূরে সরে যেতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল গাড়ির শব্দ। অজ্ঞাতকুলশীলদের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্রই থেমে গিয়েছিল যে জীবনচক্র, অনতিকাল পরেই সেটা আবার আবর্তিত হতে শুরু করল যথানিয়মে।

তবে নিথর চৌবাচ্চার জলে যে সাময়িক আলোড়ন উঠল, তার সাক্ষী থাকল শুধু নীরব রাত।

কুয়াশার রঙ কালো

নীল কি শুধু রোম্যান্টিসিজমের রঙ, যাকে দেখলেই মনের ভিতরে জেগে ওঠে প্রেমাবেগ? নাকি নীল বিষের রঙ, যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যন্ত্রণাময় মৃত্যুর হিমেল ইশারা? সাহিত্যিক বা মনস্তাত্ত্বিকরা যাই বলে থাকুন না কেন, এই মুহূর্তে এই ঘরে চোখ রাখলে মনে হবে; নীল রঙে যতটা না আছে রোম্যান্টিসিজমের আভাস বা মৃত্যুর ইঙ্গিত, তার থেকেও বেশি আছে নিবিড় রহস্য আর তুমুল আকর্ষণ! যেসব ধোঁয়া ধোঁয়া, কালো

কালো ছায়া লেপটে আছে ঘরের প্রতিটা জিনিসের সঙ্গে, তারা যেন সেই রহস্যের অতল থেকে উঠে আসা একেকটা চরিত্র! হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের পুরোপুরি দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তল পাওয়া যায় না তাদের কর্মকাণ্ডের... কেবল তাদের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির আভাসটুকু পাওয়া যায় মাত্র!

শুধু কি ওই ছায়াশরীরিরা? কেউ যেন অন্তরাল থেকে লক্ষ রাখছে এই ঘরে বয়ে চলা প্রতিটা মুহূর্তের প্রতি; সব হিসাব যত্ন করে খাতায় তুলে রাখছে সে। কে সে? কী তার পরিচয়? জানা যায় না। শুধু অবচেতনে অমোঘ হয়ে থাকে তার হিমেল উপস্থিতি!

ক্রমাগত স্যুইং করে চলেছে শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র; ফলত, ঘরটা এখন তুমুল ঠান্ডা। দেয়াল-ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটা ছোট্ট ছোট্ট লাফে পার করে ফেলছে একেকটা ঘর। সেই মৃদু টিক্‌টিক্ শব্দ ঘরের নীরবতাকে খানখান করার বদলে যেন আরও জমাট, আরও রহস্যময় করে তুলছে। ঘড়ির আওয়াজ তো নয়, যেন কোনও অদৃশ্যচারীর বুকের ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্। নীলাভ সমুদ্রে অজানিতের ডাক হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই তরঙ্গ; আর মৃদু কম্পাঙ্ক আলগোছে ছুঁড়ে দিচ্ছে শিহরনময় ইশারা। রোম খাড়া হবেই!

শার্টটা প্যান্টের ভিতরে গুঁজতে গুঁজতে বিছানার দিকে একবার তাকাল রোহিতাশ্ব। কিছুক্ষণ আগের সুখস্মৃতিটা যেন পলকের জন্য জেগে উঠল ওর মনে। নরম গদিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে পৌলমী। রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, যেন ওই বিছানারই একটা অংশ ও, পাতলা চাদর অগোছালোভাবে ঢেকে রেখেছে ওর নরম শরীরের কিছু কিছু অংশ। বেআব্রু অংশগুলো যে ভীষণভাবে লোভনীয়, সেই ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। চামড়ায় মোড়া রক্ত-মাংসের শরীর তো নয়, যেন দলা দলা মাখন; সমস্ত ভাঁজ বেয়ে বয়ে চলেছে যৌনতার উষ্ণ স্রোত। কী আহ্বান! কী আবেদন! দেখলে যে কোনও পুরুষেরই ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করবেই করবে।

কিন্তু ওই মাখনটাকে কিছুক্ষণ আগেই চেটেপুটে এঁটো করে ফেলেছে রোহিতাশ্ব। যদি খোঁজা যায়, এখনও হয়তো সেই আহার-গ্রহণের চিহ্ন কিছু কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং, এখন আর ওর প্রতি রোহিতাশ্বের বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই। আর তাছাড়া, কিছুটা তাড়াও আছে ওর। এখান থেকে বেরিয়ে ওকে বাজার করতে হবে, জরুরি কতকগুলো ওষুধ কিনতে হবে, সার্ভিস সেন্টার থেকে সফটওয়্যার আপডেট করতে দেওয়া ল্যাপটপটা সংগ্রহ করতে হবে, ট্যাক্সের কিছু ঝামেলা মেটাতে হবে... রোহিতাশ্ব জীবনে

আবেগ এবং আনন্দ-ফুর্তিকে যতটা গুরুত্ব দেয়, ঠিক ততটাই গুরুত্ব দেয় আদ্যোপান্ত ব্যবহারিক বিষয়গুলোকেও। এই ব্যাপারে ও যথেষ্ট সিরিয়াস! তবে এতটা তাড়া যদি না থাকত, রোহিতাশ্ব হয়তো আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারত ওই বিছানায়। জীবন্ত একটা পাশবালিশকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঘুমোনোটা বেশ প্রশান্তিদায়ক।

যত্ন করে পোশাক পরার ব্যাপারটা সমাধা করল রোহিতাশ্ব; পকেট থেকে ছোটো চিরুনিটা বের করে, পাট পাট করে আঁচড়ে নিল চুল; বেল্টের ক্লিপ আটকে নিল ঠিকঠাকভাবে। আয়নার আরেকটু কাছাকাছি হয়ে, নিজের মুখটা ভালোভাবে দেখে নিল ও। যদিও কোনোকিছু খুঁটিয়ে দেখার পক্ষে আলোটা খুবই মৃদু, তবু এতক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে এটাই বেশ সয়ে গিয়েছে ওর চোখে। আপাতত সবকিছু ঠিকঠাকই মনে হল ওর। ভাগ্যিস পৌলমী লিপস্টিক পরে ছিল না! নয়তো সেটার দাগ তুলতে রোহিতাশ্বকে আরেক প্রস্থ ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হত। আর আজকাল যাসব দীর্ঘস্থায়ী লিপস্টিক উঠেছে, সেসব নির্মূল করা তো রীতিমতো একরকমের সংগ্রাম। অবশ্য রোহিতাশ্বের জীবনে এমন কেউ নেই, যার কাছে ওকে বিজাতীয় যে কোনও ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হতে পারে। তবুও, যে জীবনে স্মৃতির সাময়িক আনন্দ দেওয়ার বেশি ভূমিকা নেই, তার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলতেই পছন্দ করে ও।

কিটোর ভেলক্রো আটকে নিল রোহিতাশ্ব। তারপর, পা টিপে টিপে বিছানার ঠিক পাশে এসে দাঁড়াল ও।

নীল আলোয় নীলাম্বরী হয়ে আছে পৌলমী। ওর রেশমের মতো কালো চুলগুলো এসে পড়েছে ফরসা মুখের উপরে, পল্লবের নীচে চাপা পড়ে আছে বাদামি চোখজোড়া, লালচে কামড়ের দাগগুলো নিয়ে বুকটা ওঠা-নামা করছে ধীরে ধীরে, ওই বুকের ভিতরেই তো অনবরত ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্ করে চলেছে একদলা মাংস!

ঘুমোচ্ছে পৌলমী, গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে।

হয়তো পৌলমী স্বপ্নও দেখছে। এমন কোনও স্বপ্ন ও দেখছে, যার কথা রোহিতাশ্ব কখনও কল্পনাও করতে পারবে না। দেখুক। পৌলমীর স্বপ্নের বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই রোহিতাশ্বের। যা নিয়ে ওর আগ্রহ ছিল, তার অর্ধেক প্রাণ ভরে চরিতার্থ করা হয়ে গিয়েছে। বাকি অর্ধেকও হবে ধীরে ধীরে। অত তাড়া কীসের? বড়ো মাছ তোলার আগে একটু খেলিয়ে নেওয়া

ভালো। আর রোহিতাশ্ব যে খেলোয়াড় হিসাবে কতটা দক্ষ, সেই প্রমাণ তো ও ইতিপূর্বে বহুবার দিয়ে ফেলেছে...

আপাতত পৌলমী থাকুক পৌলমীর মতো, আর রোহিতাশ্ব চলুক নিজের পথে।

বাদামি চামড়ার কাঁধব্যাগটা কাঁধে তুলে নিল রোহিতাশ্ব। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ও দরজা খুলে। দরজাটার লকটা স্বয়ংক্রিয়। সুতরাং, বাইরে থেকে ও হাতল ঘুরিয়ে দিতেই সেটা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে একটা লম্বা করিডর, যার পাশে সারি সারি দরজা। করিডরটা আপাতত ফাঁকা। একা একা জ্বলছে হলদে আলোগুলো। সেই আলোয় ঝকঝক করছে টাইলসের পরিচ্ছন্ন মেঝে, ইন্ডোর প্ল্যান্টসের তেক চুকচুকে পাতা। এখন যদি এই করিডরে কেউ থাকতও, অন্য কোনও আবাসিক, কেয়ারটেকার, সিকিওরিটি গার্ড কিংবা চাকরবাকরদের কেউ— তবে কি খুব অসুবিধায় পড়ে যেত রোহিতাশ্ব? যেত না। এটা একবিংশ শতাব্দী। এখানে লোকে অতি প্রয়োজন না পড়লে নিজের আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে পর্যন্ত মাথা ঘামায় না, আর রোহিতাশ্ব তো সেখানে এক অজ্ঞাতকুলশীল মাত্র... আর সিকিওরিটি গার্ড কি চাকরবাকর? তারা তো ওই বাঁধাধরা কাজটুকু করেই খালাস। অতিরিক্ত কিছুতে তাদের থোড়াই আগ্রহ আছে!

রোহিতাশ্বের সর্বক্ষণের সঙ্গী বৃন্দাবনও তো সেরকমই। বৃন্দাবন সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে নিখুঁতভাবে, মাঝেমধ্যে উপযাচক হয়ে রোহিতাশ্বের শরীরের খোঁজখবরও নেয়। কিন্তু ব্যস্, ওইটুকুই। রোহিতাশ্ব কোথায় যাচ্ছে, কে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছে, ঘরের দরজা বন্ধ করে কার সঙ্গে ও কী বিষয়ে আলোচনা করছে— এসব বিষয়ে বৃন্দাবন বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। সময়ে মাইনে পেয়ে যাচ্ছে, উৎসব-অনুষ্ঠানে বোনাস, সুবিধা-অসুবিধায় ছুটি আর অতিরিক্ত হাতখরচ... আর কী চাই?

রোহিতাশ্ব যখন করিডরের ঠিক মাঝামাঝি, তখনই বেজে উঠল ওর মোবাইলটা। নীরব জায়গাটা যেন গম্‌গম্ করে উঠল যশুদাসের ওজনদার স্বরে: মানা হো তুম বেহদ হাসিন, অ্যায়সে বুরে হাম ভি নেহি... বাড়ির নাম্বার। বৃন্দাবন ফোন করেছে।

মোবাইলটা কানে চেপে ধরল রোহিতাশ্ব, "হ্যালো। হ্যাঁ বৃন্দাবন, বলো।"

বৃন্দাবন কোনও ভূমিকা না করেই বলল, "দাদা, জলে না খুব পচা গন্ধ আসছে।"

বৃন্দাবনের স্বরটা খস্‌খসে শোনাচ্ছে, একটু কাঁপাকাঁপাও। ও যেন কোনও কারণে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে! ভয়ও কি পেয়েছে? কে জানে, হতেও পারে। বৃন্দাবন খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অল্পতেই ভয় পেয়ে যায়।

চট করে বৃন্দাবনের কথাটা পুরোপুরি বুঝতে পারল না রোহিতাশ্ব। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরেকবার জিজ্ঞাসা করল ও, "কী বলছ? গন্ধ আসছে? কোন জলে?"

"ট্যাঙ্কের জলে দাদা। আমি বাথরুম ধোবো বলে কল খুলেছিলাম। তখনই বুঝলাম। জল দেখতে পরিষ্কার; এদিকে সে কী বিচ্ছিরি গন্ধ, নাকে গেলেই বমি উঠে আসবে।"

আপাতত রোহিতাশ্বের নাকে নিজের শরীর থেকে বের হওয়া উডিশ পারফিউম আর মিষ্টি একটা ফ্লোর ক্লিনারের গন্ধ ছাড়া অন্য কিছু ঢুকছে না। অবশ্য কিছু না হোক, পারফিউমটা অন্তত ঘণ্টা-দুয়েক আগে ছড়ানো হয়েছিল। ফলে, তার সেই ভুরভুরে সৌরভ এখন কিছুটা মৃদু হয়ে এসেছে।

তবুও নিজের মনেই কিছুক্ষণ ভেবে নিল রোহিতাশ্ব। তারপর বলল ও, "ওহো। খুব অসুবিধা হল তো! ক'দিন আগে শুনছিলাম, রাস্তায় বোধহয় কোথাও কাজ-টাজ হচ্ছে, কর্পোরেশনের পাইপ ফেটেছে না কী যেন হয়েছে... মনে হচ্ছে, ওইজন্যই পাইপের জলে নোংরা মিশছে।"

"না না দাদা। টাইমের জল যখন দিল, আমি কল খুলে শুঁকেছিলাম। তখন কোনও গন্ধ ছিল না তো! আমার মনে হচ্ছে, ট্যাঙ্কের ভিতরেই বোধহয় কিছু একটা হয়েছে।"

বেশি ভাবাভাবির মধ্যে না গিয়ে সায় দিল রোহিতাশ্ব, "হুঁ, তা হতে পারে। পাঁচ-সাত মাস বোধহয় হয়ে গেল, ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করানো হয় না! আচ্ছা, ছাড়ো। আমি ফোন করে দিচ্ছি। ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার লোক এসে যাবে। ওহ্, একটা কথা শোনো। আমার তো বাড়ি যাওয়ার দেরি আছে। তার আগেই যদি সব মিটে যায়, প্লিজ একটু জল তুলে রেখো। আমি বাড়ি গিয়ে স্নান করব।"

"ঠিক আছে দাদা।"

ফোনটা কেটে, একপাশে সরে দাঁড়াল রোহিতাশ্ব। বরাবরই ওর বাড়িতে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে যে ছেলেটা, ফোন করল তাকে। ছেলেটা জানিয়ে দিল, আপাতত তার বিশেষ কোনও ব্যস্ততা নেই; সুতরাং, আধঘণ্টার মধ্যেই সে পৌঁছে যাবে রোহিতাশ্বের বাড়ি; রোহিতাশ্ব যখন খুশি জিপে-তে টাকাটা

মিটিয়ে দিতে পারে।

কথোপকথন শেষ করে, নিশ্চিন্ত মনে রোহিতাশ্ব আবার এগিয়ে চলল লিফটের দিকে। ছেলেটা যখন আসবে বলেছে, তখন আসবেই। রোহিতাশ্ব টাকাপয়সার ব্যাপারে একদম পরিচ্ছন্ন লোক; ফলে, ওর সঙ্গে সবার পেশাদার সম্পর্ক ভালোই। তাছাড়া ও ঠান্ডা মাথার, বিচক্ষণ মানুষ। অতি বড়ো ঝামেলাও দ্রুত আয়ত্তে নিয়ে আসার ক্ষমতা ওর আছে। সেইজন্যই না ওর বিজনেস পার্টনাররা ওকে এতখানি গুরুত্ব দেয়!

এবার বোতাম টিপে অপেক্ষা, কখন লিফট উপরে আসবে...

আজ সকাল থেকেই রোহিতাশ্বের ভাগ্যটা ওর সঙ্গ দিচ্ছে। গ্রহের ফেরে হোক, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় হোক কী দিনটাই শুভ হওয়ার দরুন হোক— সবকিছু যেন আজ ওর পক্ষেই চলেছে। একে তো সাতসকালেই ভালো দরে একটা মিউচুয়াল ফান্ড বিক্রি করতে পেরেছে; তারপর পৌলমীর স্বামীকে হঠাৎ নোটিশে ঝাঁসির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে এবং আটটা বাজতে না বাজতেই পৌলমী ফোন করে ওকে ডেকে নিয়েছে একটু আদিম আমোদ-প্রমোদের জন্য, এখানে আসার পথে আরেকটা মেয়ের সঙ্গে ভার্চুয়াল অন্তরঙ্গতার পথে কয়েক ধাপ এগোতে পেরেছে, তারপর পৌলমীর মতো এক উদ্ধত-যৌবনাকে প্রাণভরে ভোগ করতে পেরেছে— এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ দিন জীবনে খুব কম আসে। এখন লিফটের জন্যও খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না রোহিতাশ্বকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুধুমাত্র লিফটম্যানকে নিয়ে উপরে উঠে এল উত্তোলক যন্ত্র; নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকে, 'G' লেখা সুইচটা নিজেই টিপে দিল রোহিতাশ্ব।

লিফট নামছে। একটা একটা করে ফ্লোর উঠে যাচ্ছে উপরে; কমছে ডিজিটাল বোর্ডে ফুটে ওঠা সংখ্যার মান।

আট... সাত... ছয়... পাঁচ...

লিফটের ভিতরে সাদা একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছিল স্টিলের মেঝে, দেয়াল, সিলিং, প্যানেল। এতক্ষণের সেই ঝাঁ চক্‌চকে বাতাবরণের মধ্যে দাঁড়িয়েও যেন আচমকা চোখে অন্ধকার দেখল রোহিতাশ্ব। অদৃশ্য বাঁধ ভেঙে কুল্‌কুল্ করে গাঢ় আঁধারের বন্যা নেমে এল ওর চারপাশে। প্রথমটায় বিভ্রান্ত হয়ে গেল রোহিতাশ্ব। মাথার ভিতরটা ফাঁকা লাগল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সম্বিত ফিরতেই, হাতড়ে হাতড়ে দরজা খোঁজার চেষ্টা করল ও, গলা তুলে প্রাণপণে ডাকতে চেষ্টা করল

লিফটম্যানকে। কোনও ফল হল না— না রোহিতাশ্বের হাত স্পর্শ করতে পারল কোনও দেয়াল, আর না ওর গলা দিয়ে ফুটল কোনও স্বর। গ্যালন গ্যালন হিমশীতল কালির মধ্যে ডুবে যেতে থাকল ও; এক অজানা আতঙ্কে অসাড় হয়ে আসতে লাগল ওর হাত-পা। আর লিফটটা যেন আগের চেয়েও হাজারগুণ বেশি দুর্বার গতিতে নামতে লাগল নীচের দিকে।

রোহিতাশ্বের মনে হল, লিফটটা যেন ওকে নিয়ে ঢুকে পড়তে চাইছে একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রে!

রোহিতাশ্বের হৃৎপিণ্ডটা যখন প্রায় গলার মাঝামাঝি উঠে আসার মতো হয়েছে, তখনই লিফটের ভিতরটা ভরে উঠল এক ঝলক অপ্রত্যাশিত আলোয়।

লিফট পৌঁছে গিয়েছে ভূমিতলে। হাট হয়ে খুলে গিয়েছে ধাতব দরজা, নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে লিফটম্যান; মাথার উপরে একইভাবে পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে আগের মতোই উজ্জ্বল হয়ে। সব স্বাভাবিক।

তবে কি এতক্ষণ কিছুই হয়নি? সবই নিছক ভ্রম? নাকি সাময়িক একটা ব্ল্যাকআউট, যা রোহিতাশ্ব নিজে ছাড়া আর কেউ টেরই পায়নি? তবে ভ্রম বা ব্ল্যাকআউট, যাই হয়ে থাকুক না কেন— দুটোর কোনোটাই হেলাফেলা করার মতো বিষয় নয়। হতে পারে এটা বড়ো কোনও শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যের পূর্বলক্ষণ, হতে পারে বাড়তে থাকা সাংঘাতিক কোনও অসুখের বীজ... দুটোর জন্যই ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন।

ব্যাগটাকে শক্ত করে চেপে ধরল রোহিতাশ্ব, তারপর ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এল লিফট থেকে। পা-টা প্রথম এক-দু'ধাপ একটু অসংলগ্নভাবে পড়লেও, দ্রুত নিজের ছন্দে ফিরে এল ও।

যদিও বাইরের আলোকিত পরিবেশ স্বাভাবিক হতে অনেকটাই সাহায্য করেছিল, তবুও ট্যাক্সিতে ওঠার আগে পর্যন্ত একটা অস্বস্তি খচ্‌খচ্‌ করছিল রোহিতাশ্বের মনে। কিন্তু তারপর উপর্যুপরি কাজের চাপে সেসব উড়ে গেল চায়ের ধোঁয়ার মতো। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, বুঝতেই পারল না ও! তবে, শারীরিক বা মানসিক, আর কোনও সমস্যাই ফিরে এল না সৌভাগ্যক্রমে। নিরুপদ্রবে একের পর কাজ শেষ করল রোহিতাশ্ব, এক ফাঁকে চা-কেকও খেয়ে নিল।

ঘণ্টা চারেক পর যখন সব মিটিয়ে রোহিতাশ্ব এসে দাঁড়াতে পারল নিজের বাড়ির দরজায়— তখন ক্লান্তিতে ওর শরীর ভেঙে পড়ছে, পেটের

মধ্যে খিদেও জেগে উঠেছে প্রবল হয়ে। জুতো ছাড়তে ছাড়তে রোহিতাশ্ব জিজ্ঞাসা করল, "ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার লোক এসেছিল?"

সোফা মুছতে মুছতে ঘাড় নাড়ল বৃন্দাবন, "হ্যাঁ দাদা।"

"কী হয়েছিল?"

ঘাড় চুলকাল বৃন্দাবন, "ওই, বড়ো একটা পেঁচা মরেছিল..."

ক্লান্তির মধ্যেও অবাক হল রোহিতাশ্ব। অষ্টপ্রহর বন্ধ থাকা একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে পেঁচা ঢুকল কীভাবে? যদি ইঁদুরের মতো ছোটোখাটো প্রাণী হত, তাহলে নাহয় বোঝা যেত যে, হয়তো পাইপলাইন বেয়ে, বা অন্য কোনও উপায়ে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু পেঁচা... আরেকটা সম্ভাবনাও জেগে উঠল রোহিতাশ্বের মাথায়। আচ্ছা, আশপাশের কেউ বদমাইশি করে এই কাজ করেনি তো? পরক্ষণেই অবশ্য নিজের ভাবনাকে নিজেই নস্যাৎ করে দিল ও। রোহিতাশ্ব একটা অভিজাত এবং ভদ্র পাড়ার বাসিন্দা। ওর প্রতিবেশীরা প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত; কারোর সঙ্গে ওর কোনও শত্রুতা তো দূরস্থান, সামান্য কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি কোনোদিন! তাদের কী দায় পড়েছে এসব করার?

তাহলে কী হতে পারে...

খিদে আর ক্লান্তি এতটাই প্রবল হয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল যে, বেশিক্ষণ আর বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারল না রোহিতাশ্ব। জামা-প্যান্ট ছাড়তে ছাড়তে ও শুধু জিজ্ঞাসা করল, "জল তুলেছিলে বৃন্দাবন?"

"হ্যাঁ দাদা। ট্যাঙ্কি একদম ভর্তি করে রেখেছি।"

"কল ছেড়ে দেখে নিয়েছিলে, আর কোনও গন্ধ-টন্ধ আসছে কি না?"

বৃন্দাবন ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ দাদা। এখন সব ঠিক আছে।"

স্নিগ্ধ একটা স্নানের কথা কল্পনা করে খুশি হল রোহিতাশ্ব। কাঁধে তোয়ালে ঝুলিয়ে নিয়ে বলল ও, "তুমি তাহলে খাবার বাড়ো। আমি স্নান করে এক্ষুনি বেরোচ্ছি।"

বাথরুম সবসময়ই ঠান্ডা হয়। আর রোহিতাশ্বের বাথরুমের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁকড়া একটা পাকুড় গাছ। তার পাতার ফাঁক গলে রৌদ্র বড়ো একটা মাথা গলাতে পারে না এদিকে। ফলে, এই বাথরুমটা একটু বেশিই ঠান্ডা থাকে বছরভর।

মেঝেতে পা দেওয়া মাত্র আরাম লাগার সঙ্গে সঙ্গে যেন শরীরটা শিরশির করে উঠল রোহিতাশ্বের। পরক্ষণেই অবশ্য সয়ে গেল সেটা।